CHAPTER 3

জননীতি (Public Policy)

- ধারণা, প্রাসঙ্গিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ
- প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন

জননীতি ইদানীংকালে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত জননীতি রাষ্ট্র বিজ্ঞান, জনপ্রশাসন এবং কিয়দাংশে অর্থনীতির মধ্যে নিজেকে আলোচ্যসূচী হিসেবেই রেখেছে। যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (মূলতঃ শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র) নিয়ে আলোচনা করে তথাপি প্রতিষ্ঠানগুলি নীতি প্রণয়নের দিকটিকে সেভাবে গুরুত্ব দেয় নি। জননীতি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে।

জননীতি সাধারণতঃ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কিত ঘোষণাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে এর মাধ্যমে কাজের গতিপ্রকৃতিকে যেমন অনুধাবন করা যায় তেমনই এটি সামাজিক মূল্যবোধকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জননীতির বিখ্যাত তাত্ত্বিক ইয়েহেজ্‌কেল ড্ররের (Yehezkel Dror) মতে আন্তনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রণীত নীতিগুলি বিভিন্ন কাজকে চিহ্নিত করে থাকে। পিটার সেলফের মতে কার্য বিশ্লেষণ ও সম্পাদনের পরিবর্তিত নির্দেশিকা নীতির মাধ্যমেই সম্ভব হয়। জিওফ্রে ভিকারস্ (Geoffre Vickers)-এর মতে নীতি হল সেই সকল সিদ্ধান্তসমূহ যা কাজের ক্ষেত্রে সঙ্গতি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা দায়বদ্ধ থাকে। জেমস এ্যান্ডারসনের মতে নীতি হল কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের দ্বারা লক্ষ্যভিত্তিক কাজের অভিমুখ নির্ধারণ। ডেভিড ইস্টন জননীতিকে সমগ্র সমাজের মূল্যবোধের কর্তৃত্বমূলক বন্টন হিসেবে অভিহিত করেছেন।

হগউড এবং গুন (Hogwood and Gun) জননীতির কতগুলি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল—

(ক) জননীতি হল পর্যবেক্ষকের বিষয়গত সংজ্ঞা।

(খ) এর মাধ্যমে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের বিভিন্ন ধরন দেখা যায়।

(গ) নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় অনেক উপনীতি থকে এবং এর ব্যাপ্তি হয় দীর্ঘ সময় ধরে।

(ঘ) জননীতির উদ্দেশ্য অনেক সময় পরিবর্তিত হতে পারে এবং অতীতকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেও সংজ্ঞায়িত হতে পারে।

(ঙ) এটি সিদ্ধান্ত প্রণেতার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।

(চ) জননীতি কাজ করার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা উভয়কেই চিহ্নিত করে। সরকার কি করতে চায় এবং কি করতে চায় না তা জননীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

(ছ) নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া সংগঠনের অভ্যন্তরীন এবং আন্তঃসংগঠন সম্পর্কিত বিষয়কে গুরুত্ব দেয় এবং সরকারী এজেন্সীর ভূমিকাকে আলোচনা করে।

(জ) জননীতি অনেক অংশীদারকে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন—নীতিপ্রণেতা, আমলাতন্ত্র, নীতির উপকারগ্রহীতা, স্বার্থান্বেষীগোষ্ঠী, বিশেষজ্ঞ এবং গণমাধ্যম প্রভৃতি।

(ঝ) জননীতিকে অনেক প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হয়। এই প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সম্পদ, অনুমান, বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীর প্রতিক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

জননীতি সাধারণ ও বিশেষীকৃত হতে পারে। এর প্রকৃতি সংকীর্ণ কিংবা ব্যাপক হতে পারে। স্বেচ্ছাধীন ও বিস্তৃত হতে পারে। সাধারণভাবে জননীতি আর্থ সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় এবং সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে।

জননীতির প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Public Policy) : অতীতে রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করা হত পুলিশ রাষ্ট্র হিসেবে। রাষ্ট্রের কাজ মূলতঃ সীমাবদ্ধ থাকত নাগরিকদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষায়। কিন্তু পর্যায়ক্রমে পুলিশরাষ্ট্র কল্যাণকর রাষ্ট্রে বিবর্তিত ও বিকশিত হয়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা থেকে আর্থ সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণের বিকাশের চাহিদাকে মাথায় রেখে পরিকল্পিত বিকাশের জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সুষম বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়। পশ্চাদপদ শ্রেণির উন্নতির জন্য এবং গ্রামীন বিকাশের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য গৃহীত নীতির মধ্যে আছে ভূমি সংস্কার, খাদ্য, নিরাপত্তা, জাতীয় কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতিসমূহ।

ভারতবর্ষকে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের যেমন ভূমিকা আছে তেমনই বেসরকারী উদ্যোগপতিদের ও ভূমিকা নিতে হয়। বিশ্বায়ন পরবর্তীযুগে সরকারকে যেমন অনেক বেশি সুপরিবর্তনীয় নীতি গ্রহণ করতে হয় তেমনই বেসরকারী উদ্যোগকেও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশীদার হতে হয়। সরকারকে যেমন জাতীয় স্বার্থ দেখতে হয়, তেমনই সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতিও যত্নশীল হতে হয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। সেজন্য বিশ্বায়ন পরবর্তীযুগে বেসরকারী সংস্থা, আমজনতা ও আন্তর্জাতিক শক্তির চাপের নিরিখে জননীতির গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

জননীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনজীবনকে প্রভাবিত করে থাকে। জননীতি সরকারী সিদ্ধান্তের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে। জননীতি নীতি প্রণেতাদেরও আর্থ সামাজিক শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং জনগণের উদ্ভূত চাহিদা সম্পর্কেও আলোকিত করে। এই সকল আন্তঃসম্পর্ক এবং রাজনৈতিক-সামাজিক প্রক্রিয়া সরকারের নির্দেশিকা ঠিক করতে সাহায্য করে। সরকারী প্রশাসনের পরিধি ও পরিসরের ব্যাপৃতি জননীতির গুরুত্বকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলেছে।

জননীতির দৃষ্টিভঙ্গীর সমূহ (Approaches to the Study of Public Policy) :

অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের মত জননীতির বিশ্লেষণ ও আলোচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী ও মডেলের গুরুত্ব অপরিসীম। টমাস. আর. ডাই মডেলের অপরিহার্যতা সম্পর্কে পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

(ক) রাজনীতির ও জননীতি সম্পর্কে মডেল/দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের ভাবনাকে স্পষ্ট ও সরলীকৃত করে।

(খ) নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক ও সমস্যাগুলিকে শনাক্ত করে।

(গ) রাজনৈতিক জীবনের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগকে সহজ করে তুলে।

(ঘ) গুরুত্বের নিরিখে মডেল জননীতিকে বুঝতে সাহায্য করে।

(ঙ) দৃষ্টিভঙ্গী বা মডেল জননীতির ব্যাখ্যা করে এবং এর ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পোষন করে থাকে।

জনপ্রশাসনে যে দৃষ্টিভঙ্গী বা মডেলগুলি চিহ্নিত হয়ে থাকে সেগুলি হল—প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গী, গোষ্ঠীতত্ত্ব, অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গী, ক্রমবর্দ্ধমান মডেল, গেম থিওরি, জন পছন্দের তত্ত্ব, ব্যবস্থাপক তত্ত্ব, যুক্তিবাদী তত্ত্ব, প্রক্রিয়াগত মডেল।

প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গী (Institutional Approach) : সাধারণভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং জনপ্রশাসনে সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠাগুলির মধ্যে আইনসভা, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী পরিষদ, বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝায়। জননীতি ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। সরকার বা তার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা প্রণীত সিদ্ধান্তই জননীতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ সরকারই জননীতিকে বৈধতা দেয়। জননীতির পিছনে যেহেতু সরকারের অনুমোদন থাকে সেহেতু জনগণ এই নীতিকে মান্যতা দেয়।

সাবেকী আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং জনপ্রশাসনে সরকার পরিচালনায় প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত দিককেই প্রাধান্য দেওয়া হত। কিন্তু নীতির প্রেক্ষাপট, নীতি প্রণয়নের এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া খুব একটা গুরুত্ব পেত না। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটাই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জননীতি পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। জননীতি আলোচনার প্রাথমিক পর্বে প্রাতিষ্ঠনিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের ধারণাকে সুদৃঢ় করে।

গোষ্ঠী তত্ত্ব (Group Theory) : গোষ্ঠীতত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে সরকারী প্রশাসনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে জনগণ মিলিত হয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করে এবং তাদের চাহিদা সরকারের সামনে উপস্থাপিত করে। ডেভিড ট্রুম্যানের মতে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অংশীদারি মনোভাব নিয়ে তাদের দাবি সমাজে অন্য গোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপিত করে। গোষ্ঠীগুলি সাধারণতঃ স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হয়ে থাকে এবং আর্থার বেন্টলের মতে সমাজ হল বিভিন্ন গোষ্ঠীর জটিল সমষ্টি এবং সমাজে প্রতিটি গোষ্ঠীই তাদের সর্বোত্তম স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়। নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় প্রতিটি গোষ্ঠীই তাদের সুবিধা আদায়ের জন্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। রাজনৈতিক সমাজে নীতি প্রণেতারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

টমাস ডাই এই প্রক্রিয়ার চারটি উপায়ের কথা বলেছেন। এগুলি হল—

(ক) গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের পদ্ধতির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম তৈরি করা।

(খ) স্বার্থের মেলবন্ধন এবং ভারসাম্য তৈরি।

(গ) নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে স্বার্থগুলির আপোষ মীমাংসা।

(ঘ) এই আপোষগুলির ভারসাম্য সাধন।

গোষ্ঠীতত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে জননীতি প্রণীত হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের মাধ্যমে তৈরি ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে। এই ভারসাম্য নির্ভর করে স্বার্থগোষ্ঠীর আপেক্ষিক প্রভাবের ওপর। গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি বা হ্রাসও জননীতিকে প্রভাবিত করে থাকে। আইনসভা ও গোষ্ঠী সংঘাতকে মান্যতা দেয় এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থকেই আপেক্ষিকভাবে জননীতিতে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

গোষ্ঠীর শক্তি নিরূপিত হয় বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে এবং গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি হল সংগঠনের সদস্য সংখ্যা, নেতৃত্বের ক্ষমতা ও দক্ষতা, সম্পদ এবং নীতি প্রণেতাদের কাছে সহজে পৌঁছানোর ছাড়পত্র ইত্যাদি। গোষ্ঠীগুলি তাদের অনুকূলে নীতি প্রণয়নের জন্য দর কষাকষি, আপোষ ও চাপ সৃষ্টি করে থাকে। শাসকদলের আনুকূল্যপুষ্ট গোষ্ঠী তাদের অনুকূলে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধালাভ করে থাকে।

অভিজাত তত্ত্ব (Elite Theory) : অভিজাত তত্ত্ব বা Elite Theory-র প্রবক্তাদের মতে সমাজে অভিজাত শাসক শ্রেণির মূল্যবোধ বা ধারণাই জননীতিতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে জননীতি সাধারণ জনগণের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে বলে জনমানসে প্রতিপন্ন করা হয় কিন্তু বাস্তবে জননীতি প্রণয়নে সমাজের অভিজাত শ্রেণিরাই কার্যকরী ভূমিকা নেয় অর্থাৎ জননীতির চালিকা শক্তি হল সমাজের অভিজাত শ্রেণি। উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত সব রাষ্ট্রব্যবস্থায় জননীতি প্রণয়নে অভিজাত ও শাসকশ্রেণির ধারণাই বিবেচিত হয়। এই ধারণার যুক্তি হল যে সাধারণ মানুষের জননীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই এবং তারা নিজেদের এবং রাষ্ট্রের ভালোমন্দ সম্পর্কে অবহিত নয়। সুতরাং সামগ্রিক জনকল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণিকে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

টমাস ডাই অভিজাত তত্ত্ব বা এলিট থি[illegible]র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেছেন। এগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) সমাজে দুধরনের মানুষ আছে—এক ধরনের মানুষের হাতে ক্ষমতা ও প্রভাব আছে এবং অন্য আর এক ধরনের মানুষের হাতে ক্ষমতা ও প্রভাব নেই। ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী মানুষেরাই জননীতি প্রণয়ন করে থাকে।

(খ) অভিজাতরা সমাজের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত এবং সাধারণ জনগণ থেকে তারা পৃথক ও স্বতন্ত্র।

(গ) নন-এলিট থেকে এলিট শ্রেণিতে মানুষেরা উত্তীর্ণ হয় কিন্তু খুব ধীরগতিতেও ক্রমান্বয়ে।

(ঘ) এলিট শ্রেণি জননীতি প্রণয়নের সময় সহমতের ভিত্তিতে সমাজের সাধারণ মঙ্গল ও মূল্যবোধকে বিবেচনায় রাখে।

(ঙ) জননীতিতে পরিবর্তন ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে এবং এলিট শ্রেণির লালিত মূল্যবোধকে বজায় রাখে।

(চ) সাধারণ জনগণ এলিটদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট থাকে না বরং তারা উদাসীন থাকে। অন্যদিকে এলিটরা সাধারণ জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ক্রমবর্ধমান মডেল (Incremental Model) : ক্রমবর্ধমান তত্ত্ব বা ইনক্রিমেন্টাল মডেল অনুযায়ী, জননীতি হল পূর্বতন সরকারের গৃহীত নীতিতে কিছু পরিবর্তন মাত্র। নতুন সরকার কখনই পুরনো নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চার্লস ই. লিন্ডব্লম প্রথম ইনক্রিমেন্টাল মডেল উপস্থাপিত করেন। এই মডেল অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রণেতারা প্রচলিত বা প্রস্তাবিত নীতির পর্যায়ক্রমিক সমীক্ষা ও মূল্যায়ন করে না। সময় ও তথ্যের অভাবে তারা বিকল্প ও ফলাফল যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করে মোটামুটি রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

লিন্ডব্লম এই মডেলের তিনটি ধরনের কথা বলেছেন : সহজ ক্রমবর্ধমান বিশ্লেষণ (Simple Incremental Analysis); কৌশলগত বিশ্লেষণ (Strategic Analysis) এবং অসম্পৃক্ত ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া (Disjointed Incrementalism)। সহজক্রমবর্ধমান বিশ্লেষণে প্রচলিত নীতির পরিবর্তে প্রস্তাবিত বিকল্প নীতির পার্থক্য খুবই নগন্য হয়ে থাকে। কৌশলগত বিশ্লেষণে কিছু সুচিন্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যেমন ব্যবস্থাপক বিশ্লেষণ, প্রয়োগগত গবেষণা, লক্ষ্যভিত্তিক পরিচালন এবং কর্মসূচী মূল্যায়ন নিরীক্ষণ কৌশল ইত্যাদি। অসম্পৃক্ত ক্রমবর্ধমান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি নীতি অন্য-নীতির তুলনায় খুবই কম পৃথক হয়ে থাকে এবং কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখানে লক্ষ্য নির্ধারিত হয় লভ্য সম্পদের ভিত্তিতে এবং নীতি প্রণীত হয় ভুল এবং সংশোধনের (Trial and error) চেষ্টার মাধ্যমে। এই কৌশলকে অসম্পৃক্ত বলা হয় কারণ এখানে গৃহীত সিদ্ধান্ত কোন নিয়ন্ত্রন এবং সমন্বয়ের দ্বারা আবদ্ধ থাকে না। এই মডেলে নীতিতে বড়সর পরিবর্তন আনা হয় না যদি না সংশ্লিষ্ট নীতি সার্বিকভাবে অসন্তোষজনক হয়। সাধারণতঃ বহুত্ববাদী সমাজে এই ধরণের মডেল ব্যবহার করা হয়।

গেম থিওরি (Game Theory) : গেম থিওরি যৌক্তিক সিদ্ধান্তের লক্ষ্যে চালিত হয় এবং এখানে দুই বা ততোধিক অংশগ্রহণকারীর পছন্দের সুযোগ থাকে এবং প্রত্যেকের পছন্দের ওপর ফলাফল নির্ভর করে। এই তত্ত্বে সর্বোৎকৃষ্ট পছন্দ বলে কিছু নেই। এই ধারণায় নীতি প্রণেতারা শুধুমাত্র তাদের চাহিদা বা যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটাবে না; অন্যের ইতিকর্তব্য সম্পর্কেও তাদের প্রত্যাশা থাকবে। এখানে পছন্দগুলি হল আন্তঃনির্ভরশীল। এখানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতীয় সরকার হতে পারে। এই তত্ত্বের নিয়ম অনুসারে সকল অংশগ্রহণকারীর পছন্দের সুযোগ থাকে। এখানে সাধারণ অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিবেচ্য বিষয় নয় কিন্তু যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিযোগীতামূলক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কৌশল হল গেম থিওরির অন্যতম ধারণা যেখানে অংশগ্রহণকারী বিরোধীপক্ষের সকল গতিপ্রকৃতি ও কৌশল বিবেচনা করে সর্বোত্তম লাভ করতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো গেম থিওরি জননীতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে কি না? সাধারণতঃ সমাজ বিজ্ঞানীরা গেম থিওরিকে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি হিসেবেই ব্যবহার করে। সরকারী প্রশাসকরা এই তত্ত্বকে প্রদর্শক হিসেবে বিবেচনা করেনা। গেম থিওরি বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। নীতি প্রণেতা ও নীতিবিশ্লেষকরা নিজেদের এবং বিরোধীদের লাভের মূল্য হিসাব করতে সক্ষম হয় না। এই তত্ত্ব সাধারণ কূটনীতি, যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার, আন্তর্জাতিক স্তরে মীমাংসার ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হয়।

জনপছন্দের তত্ত্ব (Public Choice Theory) :

জনপছন্দের তত্ত্ব জননীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের প্রয়োগ ঘটায়। সাধারণভাবে অর্থনীতি বাজারকে কেন্দ্র

করে ব্যক্তি স্বার্থের বিকাশ ঘটায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সরকারী ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। জনস্বার্থের পরিধির মধ্যে সাধারণ মানুষ তাদের ব্যক্তিস্বার্থকে চরিতার্থ করতে চায়। অর্থনীতিতে ব্যক্তি তার মুনাফা বাড়াতে চায় এবং রাজনীতিতে রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা সামাজিক কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের নামে মূলতঃ নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভোটার, আইনসভার সদস্য, রাজনীতিক, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সদস্য সকলেই রাজনীতিতে তাদের সংশ্লিষ্ট স্বার্থপূরণে তৎপর থাকে। বাজারে যেমন ব্যবসায়ীরা তাদের স্বার্থসাধনে মনোনিবেশ করে সেরকমই রাজনীতিতেও বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী তাদের স্বার্থ চরিতার্থে ব্যস্ত থাকে। রাজনীতিতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এবং নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে মানুষ মিলিত হয়। নোবেল অর্থনীতিবিদ জেমস বুচানন মনে করেন বাজারে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একইভাবে নিজেদের স্বার্থ ও কল্যাণের কথা ভেবে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ব্যক্তিও সমষ্টি চুক্তির মাধ্যমে সরকার গঠন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলে। এদিক থেকে জনপছন্দের তত্ত্বের সঙ্গে সামাজিক চুক্তি মতবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জনপছন্দের তত্ত্ব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কিভাবে জননীতিকে প্রভাবিত করে তা নিয়েও আলোচনা করে।

ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গী (System Approach) : এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাহ্যিক পরিবেশগত উপাদানকে জননীতি কিভাবে সাড়া দেয় তা নিয়ে আলোচনা করে। রাজনৈতিক দল, এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন শক্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে থাকে। সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে জননীতি প্রণয়ন করে থাকে। বিভিন্ন সংগঠন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের চাহিদাকে "ইনপুট" আকারে সরকারের কাছে পেশ করে। সরকার সীমিত সম্পদের মধ্যে সেগুলিকে সাধ্যমত নীতির আকারে প্রণয়ন করে যা 'আউটপুট' নাম পরিচিত। ডেভিড ইস্টন এই 'আউটপুট'গুলিকে মূল্যবোধের কর্তৃত্বমূলক বন্টন (Authoritative Altocatronof Valmes) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে ব্যবস্থা বা 'System' বলতে বোঝায় শনাক্তকরণযোগ্য কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গতিপূর্ণ কার্য সম্পাদন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ইনপুট বা চাহিদাকে কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্তের দ্বারা আউটপুট বা নীতিতে পরিণত করে। প্রতিষ্ঠানগুলি আইনসম্মতভাবে এই কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। এখানে ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলি আন্তসম্পর্কিত এবং তারা অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবে সাড়া দেয়। ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার জন্য কোন শক্তি ব্যবস্থাকে অস্থির করতে পারে না। ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গী জননীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক।

যুক্তিবাদী মডেল/দৃষ্টিভঙ্গী (Rational Model/Approach) : এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে জননীতি তখনই যুক্তিসঙ্গত হয় যখন সর্বাধিক সামাজিক লাভ হয়ে থাকে। সরকারকে নীতি প্রণয়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যে কোনো নীতি প্রণয়নের ফলে লাভের থেকে ব্যয় বেশি না হয়। সর্বাধিক সামাজিক লাভের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথমতঃ এমন কোনো নীতি প্রণীত হবে না যাতে ব্যয় লাভকে ছাপিয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিকল্পগুলির মধ্যে এমন নীতি বাছতে হবে যেটি ব্যয়ের তুলনায় বেশি সুবিধা দেবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মূল্য কতটা ত্যাগ করা হল এবং তার বিনিময়ে কতটা সুবিধা লাভ করা গেল তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নীতিপ্রণেতাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয় :

(ক) সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত পছন্দ।

(খ) নীতির সকল বিকল্প।

(গ) নীতির বিকল্পগুলির সম্ভাব্য ফলাফল।

(ঘ) নীতির বিকল্পগুলির ব্যয়ের সঙ্গে সুবিধার অনুপাত।

(ঙ) বিকল্পগুলির মধ্যে সর্বাধিক কার্যকরী এবং ব্যবহারযোগ্য নীতি।

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে নীতি প্রণেতারা সমাজে বেশিরভাগ জনগণের সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দাবি করে। নীতি প্রণেতা জনগণের জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। সামাজিক সুবিধার চাহিদা যেহেতু ব্যক্তি বিশেষে পৃথক হয় সেহেতু এটি সহজেই পরিমাপ করা যায় না। নীতি প্রণেতারা বেশিরভাগই তাদের ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থকে বিবেচনার মধ্যে রাখেন। আপামর জনগণের সুবিধা বেশিরভাগ সময়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। তাছাড়া তথ্য প্রযুক্তির যুগে ব্যয় ও লাভের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে নীতি প্রণেতারা অনেক সময়ই সক্ষম হয় না। তথাপি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী জননীতি বিশ্লেষণে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে।

প্রক্রিয়াগত মডেল (Process Model) : বহুযুগ ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং অংশগ্রহণকারীদের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আচরণবাদী তাত্ত্বিকরা নির্বাচকমণ্ডলীর আচরণ ও কার্যকলাপ, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে আলোচনা করে। সাম্প্রতিক কালে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কার্যকলাপের সঙ্গে জননীতির সম্পর্ক নিরূপনে প্রয়াসী হয়েছেন। এই আলোচনায় অনেকগুলি নির্দেশককে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত হতে পারে :

(ক) সরকারের কাছে চাহিদার উপস্থাপন।

(খ) কোন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(গ) সমস্যা নিরসনে নীতির লক্ষ্যে প্রস্তাব গ্রহণ।

(ঘ) গৃহীত প্রস্তাবের পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন।

(ঙ) প্রস্তাবকে আইনে কার্যকর করা।

এই পদক্ষেপের পরবর্তী স্তরে নীতিকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ শুরু হয়। এই উদ্যোগের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল—আমলাতন্ত্রকে সংগঠিত করা; পরিষেবার জন্য অর্থের ব্যবস্থা; কর আরোপন; নীতির মূল্যায়ন ও কর্মসূচীর সমীক্ষা; সরকারী কর্মসূচীর প্রতিবেদন; সমাজে কর্মসূচী গ্রহীতাদের ওপর প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়ন; প্রয়োজনে পরিবর্তনের নির্দেশদান।

যদিও প্রক্রিয়াগত মডেলের ব্যাপ্তি খুবই সংকীর্ণ তথাপি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যাবলী এবং সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ভূমিকা অনুধাবনে এই মডেল যথেষ্ট সহায়ক হয়ে থাকে।

জননীতি : প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন (Public Policy : Formulation, Implementation and Evaluation) : জননীতি প্রণয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীই চেষ্টা করে জননীতিকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করা। সেজন্য জননীতির দ্বারা প্রভাবিত প্রত্যেকেই নীতি প্রণয়নে

কমবেশি প্রভাব বিস্তার করতে স্বচেষ্ট হয়। যেহেতু নীতি প্রণয়নে সকলেই নিজস্ব প্রভাবের মাধ্যমে কম বেশি ক্ষমতা বিস্তার করতে চায় সেহেতু নীতি প্রণয়নে আবশ্যিকভাবেই ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

নীতি প্রণয়নে সাধারণ জনগণ, রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, মন্ত্রী পরিষদ, আমলাতন্ত্র এবং আইনসভা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণকেই শক্তির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জনগণই প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পন করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের পক্ষে নীতি প্রণয়ন করে থাকে এবং তারা চূড়ান্তভাবে জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। কিন্তু বাস্তবে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা খুব নগণ্যভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া বেশিরভাগ জনগণই ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে সরকারী নীতি প্রণয়নে জনস্বার্থকে বিবেচনার মধ্যে আনতেই হয়।

স্বার্থান্বেষীগোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ব্যক্তি এককভাবে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নগন্য ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া স্বার্থের সংঘাত হেতু ব্যক্তি বিশেষনীতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা বা মত পোষণ করে থাকে। এই কারণে নীতি প্রণয়নে ব্যক্তির তুলনায় গোষ্ঠীর ভূমিকাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী ব্যক্তি সমষ্টির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে মিলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ব্যক্তি ও নীতিপ্রণেতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নীতি প্রণেতার কাছে জনগণের বিভিন্ন অংশের সাধারণ চাহিদা উপস্থাপিত করে থাকে এবং অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, মতামত এবং রাজনৈতিক সমর্থনও দিয়ে থাকে। কিন্তু সকল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক আনুগত্য থাকে না। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে রাজনৈতিক দল। সংসদীয় গণতন্ত্রে ঘোষিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজনৈতিক দল ঘোষিত কর্মসূচী সরকারী নীতিতে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। এদিক থেকে রাজনৈতিক দলগুলিকে সরকার ও জননীতির ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রনের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারা জনগণের চাহিদাকে সরকারী নীতিতে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। শুধু সরকারী দল নয় বিরোধী দলগুলিও আইনসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে জনগণের জ্বলন্ত ইস্যুগুলিকে সামনে রেখে সরকারকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করতে বাধ্য করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভাই জনগণের ইচ্ছাকে সরকারী নীতিতে প্রতিফলিত করার কার্যকরী প্রতিষ্ঠান। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ঘোষিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এবং আইনই গণতন্ত্রে জনমতকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। আইনসভা সরকারী নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যেমন অংশ গ্রহণ করে তেমনই সরকারীনীতিকে নিয়ন্ত্রন করতেও সক্ষম হয়।

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হল গণমাধ্যম। যদিও গণমাধ্যম নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না তথাপি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান, ঘটনা ও জনগণের চাহিদাকে তুলে ধরে গণমাধ্যম নীতি প্রণেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। একদিকে যেমন জনমতকে প্রভাবিত করে ইতিবাচক নীতি প্রণয়নে সমর্থ হয় তেমনই প্রণীত নীতির নেতিবাচক প্রভাবকে প্রচার করে সরকারী নীতির সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমকা গ্রহণ করে। আধুনিককালে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর গণমাধ্যমের প্রসারের ফলে নীতি প্রণেতাদের অনেক বেশি সজাগ থাকতে হয়।

নীতি প্রণয়নে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন শক্তির ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় এবং এই সকল শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে নীতির গতিশীলতাও পরিলক্ষিত হয়।

নীতির বাস্তবায়ন (Policy Implementation) : নীতি প্রণয়ন যেমন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য তেমনই নীতির বাস্তবায়ন সরকারের ততোধিক দায়িত্বের মধ্যে বিবেচিত হয়। নীতির সঠিক বাস্তবায়ন না হলে জনগন নীতির কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারে না এবং সরকার জনমতের চাপে সংকটের মুখোমুখি হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে আইনসভা, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি নীতির বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় নিজেদের যুক্ত করে।

জননীতি প্রণয়নের দায়িত্ব আইসভার ওপর বর্তায় এবং শাসন বিভাগ স্থায়ী আমলাবর্গের সহায়তায় সেই আইন বাস্তবায়িত করে। তার অর্থ এই নয় যে জননীতি বাস্তবায়নে আইনসভার কোনো ভূমিকা থাকে না। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে জনমত ও গণমাধ্যম সরকার বিরোধী প্রচারে উদ্যোগী হয়। জননীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া আইনসভায় সরকার পক্ষকে বিরোধী দলের সম্মুখীন হতে হয়। আইনসভা প্রণীত নীতি বা সিদ্ধান্ত কার্যকর না হলে সরকার দায়ভার এড়াতে পারে না। আইনসভার বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াতে আইনসভাকে কড়া নজর রাখতে হয়। তাছাড়া পর্যায়ক্রমিক অডিট এবং শাসনবিভাগের উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে আইনসভা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিচার বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করলেও আইনের দ্ব্যর্থতা, অস্পষ্টতা এবং বাস্তবায়নে ত্রুটি লক্ষ্য করলে বিচার বিভাগের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। আজকাল বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনস্বার্থ মামলার বহুল প্রচলনের ফলে জননীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া নীতি বাস্তবায়নে অকার্যকারিতা দেখা দিলে বিচার বিভাগ স্বতপ্রনোদিত হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে।

নীতি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব নিতে হয় শাসনবিভাগকে। শাসন বিভাগের আবার দুটি দিক আছে—রাজনৈতিক দিক এবং অরাজনৈতিক দিক। যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদকে রাজনৈতিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অপরদিকে নীতি বাস্তবায়িত করতে তাদের প্রত্যক্ষ সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকেন অ-রাজনৈতিক আমলাবর্গ। রাজনৈতিক শাসকরা নীতিকে বাস্তবে রূপে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমলাদের কার্যকরী ও দক্ষ ভূমিকার ওপরই আস্থা রাখে। রাজনৈতিক শাসকরা নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমলাদের পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে থাকেন। সরকারী নীতি সঠিকভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রশাসক এবং আমলাদের মধ্যে সহযোগীতা এবং সমন্বয় প্রয়োজন।

অসরকারী সংগঠন (Non Governmental Organisation) বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ জননীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যেহেতু এই সংগঠনগুলির জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা থাকে সেহেতু জননীতির পরিকল্পনা ও রূপায়নে সরকার এইরকম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে থাকে। সংগঠনগুলির দক্ষতা এবং বৃত্তিমূলক জ্ঞানকে নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অনেকক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ পরিবেশে সরকারী দফতর সকল এলাকায় পৌঁছতে পারে না। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সহায়তার প্রয়োজন হয়। অনেক অসরকারী

সংগঠন উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উপস্থাপিত করে এবং এই মডেলগুলি তৃণমূলস্তরে খুবই উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। এই সকল কারণে জননীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসরকারী সংগঠন সমূহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতাও সমন্বয় প্রয়োজন।

জননীতি রূপায়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম প্রত্যক্ষভূমিকা পালন না করলেও নীতি রূপায়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। গণমাধ্যম জননীতি রূপায়নে ব্যর্থতা লক্ষ্য করলে সেগুলি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করে। এর ফলে জনমত তৈরি হয় এবং জনমতের চাপে সরকার সঠিকভাবে জননীতি কার্যকর করতে বাধ্য হয়।

জননীতি মূল্যায়ন : (Public Policy : Evaluation) :

জননীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যকারিতা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না যদিনা নীতির সঠিক মূল্যয়ন হয়। সুতরাং জননীতির প্রাসঙ্গিকতা ও উপকারিতাকে সঠিক দিশা দিতে পারে একমাত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। দ্যানিয়েল লার্নারের (Daniel Lerner) মতে তিন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এগুলি হল প্রক্রিয়াগত মূল্যায়ন, নীতির প্রভাব সংক্রান্ত মূল্যায়ন এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন।

প্রক্রিয়াগত মূল্যায়ন (Process Evaluation) : প্রক্রিয়াগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রথমত, জননীতি যে সময়ে প্রণীত হয়েছে সেই সময়কার নির্দেশিকা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা। এই পদ্ধতিতে আরও দেখা হয় যে প্রকৃত উপকারগ্রহীতারা সরকারী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে কিনা। এছাড়া এই মূল্যায়নে নীতি রূপায়নে বিলম্ব হয়েছে কিনা সেটাও দেখা হয়। দ্বিতীয়ত, এই মূল্যায়নে গৃহীত সরকারী নীতির কৌশল সম্পর্কেও মূল্যায়ন করা হয়।

নীতির প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যায়ন (Public Policy: Evaluation of its Impact) : প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যায়নে নীতি প্রণয়নের আগের সঙ্গে নীতি প্রণয়নের পরবর্তী সময়ের পরিবর্তন দেখা হয়। এই বিশ্লেষণে সরকারী গৃহীত নীতির ফলে এবং তা কার্যকর করার মাধ্যমে জনজীবনে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে সেটিই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ কার্যাবলী ও তার প্রভাব সমূহকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

সামগ্রিক মূল্যায়ন (Comprehensive Evaluation) :

মূলতঃ প্রক্রিয়াগত মূল্যায়ন এবং প্রভাবগত মূল্যায়নই সামগ্রিক মূল্যায়নকে নির্দিষ্ট করে। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রক্রিয়াগত মূল্যায়ন এবং প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যায়নের সমষ্টিই হল সামগ্রিক মূল্যায়ন। প্রক্রিয়াগত মূল্যায়ন এবং প্রভাবগত মূল্যায়ন স্বতন্ত্রভাবে কোনোটিই চালিত হতে পারে না। এই দুই প্রকার মূল্যায়ন পৃথকভাবে কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই দুই প্রকার মূল্যায়নের সমষ্টিই সমাগ্রিক মূল্যায়নকে চরিতার্থ করে এবং সামগ্রিক মূল্যায়নই জননীতির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে।

নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করার ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত ও পরিবেশ থাকার ফলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মূল্যায়নকরারী রাজনৈতিক ও পক্ষপাতমূলক আচরণ, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা, মূলায়নকারী নৈতিকতার সংকট, কার্যকরন পদ্ধতি, সম্পদ,নীতির বিষয়বস্তুর দ্ব্যর্থতা এবং অস্পষ্টতা, প্রতিবেদনের যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় ইত্যাদি।

কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে নীতির মূল্যায়ন সঠিকভাবে না হলে জননীতির সুফল আমজনতার কাছে পৌঁছায় না। সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নীতি প্রণেতারা নীতির সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়। নীতিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রেও মূল্যায়নই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সেজন্য জননীতির ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ দিক তেমনই নীতির মূল্যায়নও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

(1) জননীতির প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করো।

(2) জননীতি সম্পর্কে অভিজাত তত্ত্ব আলোচনা করো।

(3) জননীতি সম্পর্কে যুক্তিবাদী তত্ত্বের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

(4) জননীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

(5) জননীতির মূল্যায়ন সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ টীকা লেখো।

সংক্ষিপ্ত বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

(1) হগউড এবং গুণ বর্ণিত জননীতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

(2) টমাস আর. ডাই. জননীতিতে মডেল বা দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন?

(3) গোষ্ঠীতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করো।

(4) ক্রমবর্দ্ধমান মডেলের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত করো।

(5) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জননীতির সম্পর্ক প্রক্রিয়াগত মডেলে কিভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে?

(6) জননীতি বাস্তবায়নে শাসনবিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

মৌলধর্মী প্রশ্নাবলী :

(1) জননীতির সংজ্ঞা দাও।

(2) ইনক্রিমেন্টাল মডেলের প্রবক্তা কে?

(3) কৌশলগত বিশ্লেষণ কি?

(4) ব্যবস্থাপক তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

(5) যুক্তিবাদী মডেলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করো।

(6) অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনপছন্দের তত্ত্ব প্রথম কে উপস্থাপন করেন?